অভিজিৎ সেন

মহামহাবারুণী

সাধারণ বাঙালির ডায়েরি লেখার অভ্যাস নেই। এর কারণ যাই হোক আমিও সেই অনভ্যাসীদের দলে। তবুও জীবনের এতগুলো বছর পার হয়ে আসার পর সম্প্রতি একদিন পুরোনো বই, ম্যাগাজিন গুছোবার সময় খেয়াল হল খান দশ-বারো ডায়েরি আমিও যত্ন করে এখন পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছি।

কী আছে ওইসব ডায়েরিতে?

অন্যের ডায়েরি বা আত্মজীবনী পড়তে উৎসাহী ব্যক্তিরা শুনে হয়তো হতাশ হবেন যে সেখানে একটি পাতাতেও আমি আমার দৈনন্দিন জীবন, কোনো বিশেষ উপলব্ধি, স্বীকারোক্তি বা প্রতিজ্ঞা অথবা কোনো ঘোষণা এ-সব কিছুই লিখিনি। প্রত্যেকটি ডায়েরিতেই কিছু মানুষের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ছাড়া আর যা আছে, তা হল কোনো ঘটনার চুম্বক, কোনো পুরুষ কিংবা স্ত্রী, যাদের সঙ্গে আমার সেইসময় সদ্য আলাপ হয়েছে, তাদের সম্পর্কে একটি-দুটি কথা, কোনো স্থান, নদী বা দিঘির নাম, কোনো গ্রামের নাম, এইসব। অর্থাৎ অন্য-কোনো ব্যক্তি আমার ডায়েরি পড়লে সহজেই বুঝতে পারবে আমি ডায়েরির পাতায় এগুলো লিখে রেখেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। এগুলো যেন আমার স্মৃতির রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম। ওখানে চাপ দিলেই ওইসব বিষয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বা কী উদ্দেশ্যে ওগুলো লিখে রেখেছি, সবই মনে পড়ে যাবে। আর যদি ততদিনে বিষয়টা আমার মাথার মধ্যে পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়, আমি একখানা উপন্যাস, নিদেন একটি গল্প লিখব সেসব নিয়ে।

নব্বইয়ের গোড়ার দিকের লেখা একখানা ডায়েরির দু-চার পাতা উলটোতেই এক জায়গায় দেখলাম লেখা আছে 'শরের গাছ', 'বুড়ি', 'চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী', 'বারুণীর মেলা'।

কুড়ি-বাইশ বছর আগের একটা তারিখ এই লেখাগুলোর নীচে। তার কারণ ডায়েরির পাতায় যে তারিখ ছাপানো আছে, আমার লেখা সেই তারিখ অনুযায়ী নয়। চাকরিসূত্রে

তিন-চার খানা ডায়েরি উপহার পেতাম। কিন্তু আগেই বলেছি ডায়েরি লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার লক্ষ্য কয়েকটি সংকেত-শব্দে কিছু নোট রাখা।

এতগুলো শব্দ না লিখলেও চলত। রাত্রের খাওয়াদাওয়ার পর অন্ধকার ঘরের টেবিলে একটা পাঁচ ওয়াটের ল্যাম্প জ্বালিয়ে লেখার টেবিলে বসে প্রথম শব্দ 'শরের গাছ'-এ চোখ ফেলতেই কুড়ি-বাইশ বছর আগে দেখা গ্রামটা হুবহু যেন মনের পর্দায় ভেসে উঠল। গ্রামে ঢোকার মুখে বাঁ দিকে বিস্তৃত জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘন পত্র-পল্লবে সজ্জিত কয়েকটি যুথবদ্ধ গাছ। দূর থেকে মনে হয়েছিল ছাতিম কিন্তু কাছে গিয়ে মনে হল, না, সাদৃশ্য থাকলেও এ গাছগুলো ছাতিম নয়। অনুসন্ধানে আমার সঙ্গী নরেন বলল, 'না স্যার, এ গাছগুলো শরের গাছ।'

'শরের গাছ!' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'শরের গাছের তো কোনোদিন নাম শুনিনি!'

নরেন বলল, 'ওই আপনারা যাকে শেওড়া গাছ বলেন, যে গাছে ভূত থাকে, হেঁ হেঁ।'

শ্যাওড়া গাছ আমি এই প্রথম চিনলাম। বেশ ঘন পাতার বনসদৃশ কয়েকটা গাছের জটলা। গাছের নীচে একখানা জীর্ণ এবং অস্থায়ী দো-চালা। সেখানে মাটি দিয়ে তৈরি শুভ্রবসনা এক নারীমূর্তি। তার মাথার চুল এবং গায়ের রংও অত্যন্ত শুভ্র। সাধারণত বাংলার দেব-দেবীর মূর্তির মুখ, হাত ইত্যাদির রং হলুদ আভাযুক্ত শুভ্র। কাজেই এই মূর্তির গায়ের রং আমাকে মনোযোগী করেছিল।

'ও কী মূর্তি? কোনো দেবী?'

'হ্যাঁ স্যার, দেবী, ওনার নাম বুড়ি।'

নরেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার আমন্ত্রণেই আমি আজ এই কুমারগ্রামে এসেছি। আজ শনিবার। আগের কথামতো নরেন গোপালপুরে আমাদের ব্যাঙ্কের শাখায় চলে এসেছিল। শনিবার বারোটা অব্দি ব্যাঙ্কিং। বারোটা বাজতেই আমি ক্যাশিয়ারকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি ক্যাশটা বন্ধ করে দাও, আমি একটু কুমারগ্রাম যাব।'

কুমারগ্রাম গোপালপুর শাখার আওতায় পড়ে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে গ্রামের মানুষকে ঋণ দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। এই ঋণদানের জন্য ব্যাঙ্কের এলাকা ভাগ করে দেওয়া আছে। গোপালপুরের শাখার আওতায় বিয়াল্লিশটি গ্রাম। এই বিয়াল্লিশটি গ্রাম তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। কুমারগ্রাম এই বিয়াল্লিশটির মধ্যে একটি গ্রাম এবং সম্ভবত গোপালপুর থেকে না হোক দশ কিলোমিটার দূরে।

নরেনের উত্তর শুনে আমি একটু অবাক হলাম। মূর্তির পরনে সাদা কাপড় আছে

বটে, মাথার চুলও সাদা কিন্তু মূর্তি যে বানিয়েছে সেই শিল্পী তো একে যৌবনবতী চেহারাই দিয়েছে।

বললাম, 'বুড়ি! এ কেমন বুড়ি? বুড়ি কোনো দেবীর নাম হয়?'

নরেন বলল, 'গ্রামদেবতার মতো। সবাই তো এনাকে বুড়ি বলেই জানে। আমরাও তো ছোটোবেলা থেকে বুড়ি বলেই জেনেই এসেছি স্যার।'

আমি দক্ষিণবাংলার মানুষ। উত্তরের জেলাগুলিতে চাকরিসূত্রে আছি অনেকদিন। বাঙালির প্রধান দেবদেবী সর্বত্রই প্রায় একই কিন্তু উত্তরের গ্রামাঞ্চলে এই বুড়ির মতো অপরিচিত একদল দেবদেবী আছে যাদের ঠিক বুঝি না, চিনিও না।

বললাম, 'জলপাইগুড়িতে তিস্তাবুড়ির পুজো হয় বলে শুনেছি, ইনি কি সেই তিস্তাবুড়ি?'

নরেন এই গ্রামের-ই ছেলে। বলল, 'বোধ হয় না স্যার। তবে ষষ্ঠী ঠাকুরুন হলেও হতে পারেন। ছেলে-মেয়ের মায়েদের কাছেই এই বুড়িমায়ের কদর। পুজোয় বহু মানত থাকে ওদের।'

ষষ্ঠীর মূর্তি কখনো দেখিনি। আমাদের দেশের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের গ্রামের বাড়িতে বারোমাসে তেরো নয়, তেত্রিশ পার্বণের অনুষ্ঠান হত। কিন্তু স্মৃতিতে ষষ্ঠীর মূর্তি বানিয়ে পুজো করার কথা মনে পড়ে না। ঠাকুরুনের ব্রত হত নানা অভিচারে, সে কথা মনে আছে। মনে আছে বিড়ালকে মারতে গেলে এক বৃদ্ধা পিসিমা নিষেধ করতেন। সেই সূত্রেই জেনেছিলাম বিড়াল মা-ষষ্ঠীর বাহন। নরেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ষষ্ঠীর মূর্তি কখনো দেখেছ?'

সে বলল, 'দেখেছি স্যার। যদি দেখতে চান তো আজই আপনাকে দেখাতে পারি। ভেঙেচুরে গেছে, কিন্তু তিনি যে ষষ্ঠী ঠাকুরুন, তাতে সন্দেহ নেই। বাহনের চেহারাখানা একেবারে অটুট আছে, তাতেই প্রমাণ।'

শর বনের বুড়িকে ছেড়ে আমরা আবার সাইকেলে উঠলাম। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় দুটো বেজেছে। মেলা দেখে আমাকে আবার শহরে ফিরতে হবে। তার কারণ আমি মহকুমা শহরেই রাত্রিবাস করি। সেই শহর গোপালপুর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। এই চল্লিশ-চল্লিশ আশি কিলোমিটার রাস্তা প্রতিদিন আমি বাসে যাতায়াত করি। সকাল সাড়ে আটটার বাস ধরে সাড়ে দশটার আগেই আমি গোপালপুরের শাখায় পৌঁছে যাই। গ্রামের ব্যাঙ্ক, টাকাপয়সার লেন-দেন অল্পই। ভিড়ও নেই। কাজেই আমাদের আধাঘন্টা দেরি গ্রাহকরা নিয়ম বলেই যেন মেনে নেয়।

এই চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে ছ-কিলোমিটার ফেরার পথ সেদিন এগিয়ে রেখেছিলাম। কুমারগ্রাম গোপালপুরের পিছনে। অর্থাৎ বাসরাস্তার ফিরতি পথে ওই

ছ-কিলোমিটার পিছিয়ে এসে তারপরে ডানদিকে গ্রামের পথ ধরতে হবে। অর্থাৎ কাঁচা রাস্তায় যেতে হবে চার কিলোমিটার। এ রাস্তার শেষ ফিরতি বাস গোপালপুরে আসে সাতটা পঁয়তিরিশ মিনিটে। আমি যদি আজ শহরে ফিরতে চাই, তাহলে আমাকে পৌনে আটটার মধ্যে একুশ-মাইল নামক পাকা রাস্তার মোড়ে ফিরে আসতে হবে। তবে তেমন তেমন হলে যদি কোনো কারণে ফিরতে না পারি তাহলে নরেনের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালের বাসে শহরের বাড়িতে ফিরে আসতে পারব। আমরা যারা ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখায় কাজ করি এর থেকেও অপরিচিত পরিবেশে আমাদের থাকার অভ্যাস আছে।

গ্রামের ভিতর দিয়ে নরেনের পিছনে পিছনে সাইকেল চালাতে চালাতে আমি গ্রামটা যতটুকু সম্ভব দেখছিলাম। বেশ বড়ো গ্রাম এই কুমারগ্রাম। বড়ো বড়ো পুকুর দেখলাম গোটা চারেক। ভাঙা, নোনায় খাওয়া ইটের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম দুটো। কিন্তু সেসব এতটাই পুরানো যে কীসের ধ্বংসাবশেষ, তা বোঝার কোনো সাধ্য আর কারও হবে না। তবে কুমারগ্রাম যে একটা প্রাচীন এবং অনেকদিনের বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, তা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।

রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ যাচ্ছে মেলার দিকে। প্রায় প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের কোলে একটি করে শিশু। সঙ্গে আরও দু-তিনটি। পুরুষদেরও কারও কারও কাঁখে, ঘাড়ে শিশু আছে, তবে সব পুরুষের নয়। কোমরে ভাঁজ পড়া লাঠি হাতে বুড়োবুড়িও দেখলাম কয়েকজন। নরেন জানাল এরা সব দূরের গ্রামের মানুষ। কুমারগ্রাম এবং তার নিকটবর্তী দু-তিনটি গ্রামের মানুষজন অনেক আগেই মেলায় ঢুকে গেছে।

গ্রাম শেষ করে জনাসমাগম বেড়ে গেল। আমরা মেলার মাঠে এসে পড়েছি। ঠিক মাঠ নয়। একটা প্রাচীন দিঘিকে ঘিরে চারপাশে মানুষের মেলা। দিঘিটার চারপাশ বুজে এলেও এখনও একর খানেক জলা আছে। অনেক কাল আগের বাঁধানো পাড় বেশিরভাগ জায়গাতেই ভেঙে গেছে। পার থেকে জলের কুড়ি-পঁচিশ হাত ভিতর পর্যন্ত ঘাঘরার পাড়ের মতো ঘন আগাছা, জলজ উদ্ভিদ আর ঘাসের পুরু জাজিম। হয়তো হাজার বছরের দিঘি, হয়তো পাঁচশো বছরের মধ্যে কোনো সংস্কার হয়নি। চার-পাঁচটা জায়গায় পাড়ের কাছের খানিকটা করে সেই জাজিম পরিষ্কার করে বারুণীর স্নান অথবা শিশুসহ মায়েদের ডুব দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডুব দেওয়া হচ্ছে সমানে। মায়েরা শিশুদের নিয়ে কোনোমতে নেমে পড়িমরি করে উঠে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত। কোনোরকমে শিশুকে নিয়ে একটা ডুব দিয়ে দ্রুত জল ছেড়ে উঠে আসছে।

নরেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা অমন ভয় পাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে যেন জলের ভিতর থেকে ওদের দিকে কেউ হাত বাড়াচ্ছে?'

নরেন বলল, 'গত বছর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল স্যার। মশইলের একটি পরিবার এসেছিল তাদের মানত রক্ষা করতে। তাদের বউটি তার বাচ্চা নিয়ে ওই উত্তরের ঘাটে ডুব দিতে নেমে আর ওঠেনি, মানে উঠতে পারেনি। পরে অনেক খোঁজাখুঁজি হয় নৌকা নামিয়ে জাল ফেলে। কিন্তু দেহও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবার তো দেখছেন সুরক্ষার অনেক বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তবুও ভয় পাওয়া তো স্বাভাবিক স্যার। কতকাল ধরে মায়েরা তাদের শিশুদের নিয়ে ডুব দিচ্ছে, তার কোনো হিসাব নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা চলে আসছে। জলে ডুব দিয়ে দেখেছি, নীচের জল বরফের মতো ঠান্ডা। দিঘি যে কত গভীর, তাও কেউ জানে না। পাড়ের কাছের আগাছা আর ঘাসের জাজিম দেড়-দু হাত উঁচু। গোরু, ছাগল, রাখাল ছেলেরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারও তো কখনও কোনো বিপদ ঘটেনি!'

দিঘির উত্তর দিকের মাঠের মধ্যে শতখানেক মিটার দূর দিয়ে গেছে বাংলাদেশ সীমান্ত। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম দু-তিনটা পিরামিডের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ যা আসলে সীমান্তের পিলার, এখান থেকেও দেখা যায়। তার ওপারে, আমি অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি, বাঁ-দিকে কতগুলো গাছপালা, বাড়িঘরের আভাস দূরে, কলাগাছের একটা ঝাড়, তাতে অন্তত পনেরো-কুড়িটা গাছ। সেইসবের আড়ালে, আসলে এই মেলা থেকে দৃশ্যমান দূরত্বে অন্তত দুশো-তিনশো স্ত্রী পুরুষ নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাদের কোলে কাঁখে, হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো শিশু।

নরেন আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঈষৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, 'আপনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে ওপারের ওই ভিড় এপারে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, ওরা আসবে। বি এস এফ একটু সরে গেলেই ওরা এখানে চলে আসবে।'

মেলার দক্ষিণ দিকে এক জায়গায় সাইকেল রাখার জায়গা করেছে উৎসাহী ছেলেরা। নরেনের সঙ্গে সেদিকে গিয়ে আমরা সাইকেল জমা রেখে এলাম। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম আমরা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় দুটো বাজে। কুমারগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমাকে দেখে দু-তিনজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে এল।

'আপনি যে মেলায় আসবেন, তা তো জানতাম না ম্যানেজারবাবু?'

'আগে কিছু ঠিক ছিল না। মেলাটা শনিবারে পড়ল বলে নরেন বলতে রাজি হয়ে গেলাম। আপনিও কি এই কুমারগ্রামেই থাকেন?'

'না, আমি থাকি ভীমপুরে। তবে মেলা, পূজা, উৎসব, এসব থাকলে তো আসতেই হয়। তা আপনি এসে ভালোই করেছেন। এখানকার বি এস এফের কারও কি অ্যাকাউন্ট আছে আপনার ব্রাঞ্চে?'

'না, না, ওরা ওদের অ্যাকাউন্ট শহরের স্টেটব্যাঙ্কেই করে। সেও দু-একজনই করে। কেন বলুন তো?'

ততক্ষণে আরও দু-চারজন লোক প্রধানের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'নমস্কার ম্যানেজারবাবু, আমার নাম অশেষ মাহাত। আমি এই মেলা কমিটির সেক্রেটারি। আপনি আসাতে আমরা খুব আনন্দ পাচ্ছি, হেঁ-হেঁ —'

প্রধান বলল, 'আপনি এখানে উপস্থিত আছেন দেখে এরা একটু আশ্বাস পাচ্ছে। একটা সমস্যায় আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তবে ওদের একটু উপকার হয়।'

'আমার সাহায্য? মেলার ব্যাপারে?' আমি একটু অবাক হলাম। বললাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

প্রধান বলল, 'দেখছেন তো সামান্য এই মেলা। খান পাঁচ-ছয়েক মিষ্টি, তেলেভাজা, চা-বিস্কুটের দোকান। মনিহারি দোকান হবে বুঝি বারো-চোদ্দোটা, প্লাসটিকের খেলনা, বাসন-কোশন, বাঁশি, ভেঁপু, বেলুন মিলিয়ে আরও কুড়ি-বাইশটা দোকান। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, ওই যে ওপারে শ-দুই-আড়াই লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওরা প্রতিবছরই এই মেলায় আসে। দোকানিরা ওদের ভরসাতেই এতদূরের মেলায় আসতে রাজি হয়। বি এস এফ ওদের ঘণ্টাখানেক সময় দেয়। সেই সময়ের মধ্যে ওরা হুড়পাড় করে এসে যাদের ডুব দেওয়ার মানত আছে তারা ডুব দেবে, তা বাদে পাথরপুজো করবে, তারপর এপারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জড়াজড়ি করে কাঁদা-কাটা করবে। আর সবশেষে জিলাপি, রসগোল্লা, চমচম গোগ্রাসে গিলবে। তারপর কেনাকাটা করে আবার দৌড় দেবে ওপারে। এইসব করবে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে।'

আমি বললাম, 'বলেন কী? এতসব কাণ্ড হয় এখানে? কিন্তু বি এস এফ এটা অ্যালাউ করে কেন?'

প্রধান বলল, 'অনেক পুরানো কালের অভ্যাস মানুষের। তার সঙ্গে মিলে আছে ধর্ম, বিশ্বাস, মানতের মতো সব আচার-বিচার, বর্ডার সিকিউরিটি আর বাংলাদেশ রাইফেলস দু'পক্ষই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। সরকারও সব বুঝে চোখ সরিয়ে রাখে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয়, সোহাগ-ভালোবাসা — বোঝেনই তো সব।'

প্রধান লোকটিকে বেশ বুঝদার মানুষ মনে হল। বললাম, 'তো প্রধান সাহেব আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

প্রধান বলল, 'মাস দুয়েক আগে বি এস এফের গুলিতে একটা মানুষ খুন হয়েছে। সে লোকটা ওপারের মানুষ ছিল। সেই ব্যাপারে রেষারেষি চলছে দু-মাস ধরে। বি এস এফ তাই এবার আর ওদের আর আসতে দেবে না, এমন একটা খবর রটেছে। আমরা তিন-চার জন এই নিয়ে বি এস এফ কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলতে যাব। আপনি একটু আমাদের সঙ্গে যাবেন, এই আর্জি।'

'এই সেরেছে, আমি? মানে আপনারাই তো আছেন। আপনি তো এখানকার প্রধান সাহেব। আবার আমাকে—', আমি সত্যিই একটু ত্রাসগ্রস্ত হলাম। বি এস এফের লোকেরা এখানে সবসময়ই সশস্ত্র থাকে। এখানে আসার আগে আমি টমসন, স্টেক এসব বন্দুকের নাম জানতাম। আসার পরে এসব অস্ত্র ছাড়া কালাশনিকভের নাম শুধু নয়, চেহারাও হরদম দেখি।

মেলার সেক্রেটারি বলল, 'আপনি না করবেন না স্যার। ওরা যেরকম ভাষা বলে সে আমরা গ্রামের লোকতো বুঝিই না, আপনি যদি একটু সঙ্গে থাকেন—'

শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতেই হল। উত্তর দিকের মাঠের মধ্যে যেখানে বি এস এফের জনা তিনেক জওয়ানকে আগেই টহলরত দেখেছিলাম প্রধান এবং সেক্রেটারির সঙ্গে আমি এবং নরেন এগিয়ে গেলাম।

তিনজন জওয়ানের মধ্যে একজনের অসম্ভব বলশালী চেহারা। উচ্চতায় সে ব্যক্তি যে সাড়ে ছ-ফুটেরও বেশি হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আমার মাথার উপরে আরও একফুট। চেহারায় প্রমাণ সে ব্যক্তি জাঠ।

আমরা তাদের থেকে দশফুট দূরে থাকতেই সে হাত তুলে আমাদের থামতে বলল। তারপর প্রবল ভরাট গলায় বলল, 'কেয়া মাঙ্‌তা?'

প্রধান বলল, 'নমস্তে কমান্ডার সাহেব, ওই যে ওপারমে আদমি লোক খাড়া হায় না—'

জাঠ তাকে থামিয়ে আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ আদমি কৌন্ হ্যায়?'

প্রধান বলল, 'হামলোগকা ব্যাঙ্ক কা ম্যানেজার সাহেব হ্যায়।'

আমার হিন্দি ভাষার বিদ্যা প্রধানের থেকে অধিক আত্মবিশ্বাসী হবে, এমন বিবেচনা আমার ছিল না। সাহস করে বললাম, 'নমস্তে কমান্ডার সাব, হিঁয়াকা সব আদমিকা আপসে বিন্‌তি হ্যায় জরা কনসিডার করকে থোরাসা টাইমকা লিয়ে পারমিশন দেঁতে তো — কিঁউ কি, শ' শ' সালকা রেওয়াজ', এটুকু বলতেই আমার দম আটকে গলা শুকিয়ে অ্যাকসা অবস্থা।

সৈনিক ভুরু কুঁচকে আমাকে বুঝবার চেষ্টা করছিল। তার ঘাড় থেকে ঝোলানো স্টেনগান তার বিশাল দেহের কারণে একটা শিশুদের খেলনার মতো লাগছিল। সে

হঠাৎ ধমক দিয়ে বলল, 'হঠ্ যাও হিঁয়াসে', বলে আমাদের দিকে পিছন ফিরল এবং পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করল। দু-তিন পা গিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক ঘণ্টা বাদ, চার বাজেমে ছোড়েঙ্গে।'

আমরা আবার মেলার কাছে ফিরে এলাম। মেলাটা যেন শিশুদের আর তাদের মায়েদের। লাল-হলুদ নতুন গামছা গায়ে চাপিয়ে শিশু কোলে নিয়ে তিন ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে উঠছে তারা। উঠে শিশুকে তার বাপ অথবা বড়ো ভাই-বোনের হাতে দিয়ে তারা সঙ্গে নিয়ে আসা দুধের পাত্র হাতে নিল। দিঘির চারপার জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কালো পাথরের মূর্তির ভগ্নাবশেষ। কোথায় একখানা খিলান বা কোনো মন্দিরের প্রবেশপথের স্তম্ভের অংশবিশেষ। এই পাথরখণ্ডগুলোর কোনোটার ওজন হবে এক-দেড় কুইন্টাল। তবে বেশিরভাগই ছোটো টুকরো। সেইসব পাথরের খণ্ডে সিঁদুর লাগানো হয়েছে অনেক কাল ধরে। মায়েরা বাঁ-হাতে দুধের বাটি নিয়ে তাদের এলানো চুল সেই দুধে চুবিয়ে নিচ্ছে। তারপরে একদিক থেকে শুরু করে একের-পর-এক পাথরের উপরে বুলিয়ে নিচ্ছে সেই চুল। প্রতিটি পাথরকে মার্জনা করবার আগে চুল দুধের বাটিতে চুবিয়ে নিচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম সম্ভবত কোনো লুপ্ত পূজাবিধি। কী মানে হয় এই অর্চনার? দিঘি, মূর্তিভাঙা, পাথর ইত্যাদি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোনো প্রাচীন দেবালয় এখানে ছিল। সেই দেবাঙ্গন এখন ধ্বংসস্তূপ। পূজাবিধিও লুপ্ত কিন্তু হয়তো তার একটি অংশ মানুষের স্মৃতিতে এবং আচরণে রয়ে গেছে। দিঘির চারপাশ ঘিরে শিশুর কলকাকলি, বাঁশি, ভেঁপুর সহর্ষ ফুৎকার, তাদের মা-বাপের পরস্পরকে কুশল জিজ্ঞাসা, মিঠাই খাওয়া—আমি আপ্লুত হয়ে এই সম্মিলন দেখছিলাম।

আমার নিবিষ্টতা ভেঙে নরেন বলল, 'স্যার, ষষ্ঠীর মূর্তি দেখতে যাবেন বলছিলেন?'

আমি বললাম, 'ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ, চলো।'

গ্রামের পুবদিকে নরেন আমাকে নিয়ে এল। সেখানে গ্রামসীমানায় একটা প্রাচীন এবং বিশাল বটগাছ আছে। দিঘি থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। বটগাছ বেশ বিস্তৃত, অনেকটা জায়গা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। মেলার কোলাহল এখান থেকে ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। মেলার কোলাহল যত ক্ষীণ হচ্ছে বটের আশ্রয়ে থাকা পাখ-পাখালির কলস্বর তত উচ্চকিত হয়ে আমাদের কানে আসছে।

বটগাছের তলায় দু-চারটে কাঁটাসর্বস্ব উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছু জন্মাতে পারে না। বট ধীরেসুস্থে শাখা বাড়িয়ে, ছড়্ নামিয়ে মাটিকে ধরে ফেলে। সেই ছড়্ ক্রমশ শক্ত-পোক্ত হয়ে গাছকে এগিয়ে দেয়। কুমারগ্রামের বট তার বিশাল আকৃতি নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেন বলল, 'এসো'।

আমরা দু-জনে প্রবেশ করতে শুরু করলাম বটবৃক্ষের অন্তঃপুরে। আমি ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখায় কাজ করি। জমিজমার মাপজোখ বুঝি। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল এই মহাবট অন্তত পঁচিশ-তিরিশ হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে তার রাজ্য বিস্তার করেছে। মাথার উপরে অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। আর ঘণ্টা-দুয়েক বাদে এরা গাছ ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবে খাদ্য ও শিকারের সন্ধানে।

নরেনের দেখানো পথে এগিয়ে বটের একেবারে অন্দরমহলে এসে প্রবেশ করলাম আমি। পাকা বটফল, বাদুড় ও অন্যান্য পাখির বিষ্ঠা অনবরত ঝরে পড়ছে নীচে, কখনো আমাদের গায়ে, মাথায়। কুমারগ্রামের বট যেন মা ষষ্ঠীকে মূর্তিমান করেছে। হাজার লক্ষ পাখ-পাখালি, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, কাঠবিড়ালি, ভাম, আরও না-জানি কত অসংখ্য প্রজাতিকে আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে রক্ষা করছে এই বট। বটের একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে আমি একবার দাঁড়িয়ে পড়ে পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-ঊর্ধ্ব-অধঃ ভালো করে দেখে নিলাম। কোনটা যে এই বটগাছের আদিকাণ্ড, সে হদিশ এখন আর কেউ দিতে পারবে না। কিছুদূর পরপর প্রায় একই মাপের বিশাল বিশাল বটের স্তম্ভ, তার কোনটা যে আদি আর কোনটা যে জটা স্ফীত হয়ে কালক্রমে এই রূপ পেয়েছে, তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

একসময় নরেন বলল, 'এই দিকে আসুন স্যার।'

তার নির্দেশিত পথে গিয়ে অপেক্ষাকৃত লঘু এক স্তম্ভের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই স্তম্ভটির একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। পাশাপাশি প্রসারিত দু-খানা প্রকাণ্ড বাহুকে স্থায়িত্ব দিতে পরপর জটা নেমে এসে এখন যেন দু-খানা দেয়াল তৈরি করেছে খানিকটা জায়গা। তার ভিতর দিকটা মূল কাণ্ডটির দেয়াল। এইভাবে একখানা সামনের দিক খোলা ঘরের আকৃতি পেয়েছে স্থানটা। ভিতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও কিছু একটা মূর্তির আভাস পেলাম।

নরেন বলল, 'দেখুন স্যার।'

আমি গ্রামের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। আদৌ নির্ভরযোগ্য নয় এমন বাসরুটে আশি কিলোমিটার দৈনিক যাতায়াতের প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হই। সেই প্রস্তুতির মধ্যে একটা তিন ব্যাটারির টর্চও থাকে। কাঁধের ব্যাগের চেইন খুলে টর্চটা বের করলাম। গাছের সেই ঘরসদৃশ আয়তনের মধ্যে যে মূর্তি টর্চের ফোকাসে ধরা পড়ল সে পাদপীঠ সহ উচ্চতা পাঁচ ফুটের মতো এক দেবীমূর্তি।

চারদিকে বটের ছড়্ নেমেছে সরু, মোটা নানা আকৃতির। তার মধ্যে মলিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেবী যেন শাপগ্রস্ত এক অপ্রস্তুত মূর্তি। মাথার একপাশে ভাঙা ক্ষত, বাম

হাতখানার অগ্রভাগ খণ্ডিত, সেইসঙ্গে খণ্ডিত দেবীর কোলে শায়িত একটি অক্ষত মানব শিশুর একখানা পা। ডান হাতখানা অটুট, বরাভয়ের ভঙ্গিতে সামনের দিকে বাড়ানো সম্ভবত। কিন্তু যা অটুট, নিখুঁত এবং আমার টর্চের আলোয় সম্পূর্ণ দৃশ্যমান, সে হল ডান পায়ের নীচে বসে থাকা বড়ো আকারের একটি মার্জার।

বিষণ্ণ, নির্বাসিত, অভিশপ্ত যেন এই দেবসেনা ষষ্ঠী, আমাদের অবস্থান থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে বেলেপাথরের অবয়বে বন্দি হয়ে কতকাল ধরে পড়ে আছে।

আমি একটা বটের ছড়ের গুচ্ছ সরিয়ে ভিতর দিকে যাওয়ার পথ খুঁজতেই নরেন সতর্ক নিষেধ জানাল।

'আর ভিতরে যাবেন না স্যার!'

আমার পা থেমে গেল।

'কেন?'

'ভয়ংকর সাপের উপদ্রব এই বটের সাম্রাজ্যে, কখনো-কখনো নাকি দেখা যায় বটের ছড় অবলম্বন করে দোল খায় তারা।'

'তুমি কখনো দেখেছ?'

'দোল খেতে দেখিনি, তবে এখানে সাপ দেখেছি অনেকবার।'

'থাক, ওরাও বেটের বাছা।'

কিন্তু আমি আর এগোতে সাহসও করলাম না। বাড়ানো পা পিছিয়ে এল। আরও কিছু সময় টর্চ ফেলে দেবীকে দেখলাম। মন কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

নরেন বলল, 'চলুন স্যার, ফেরা যাক।'

পুরানো পথেই ফিরে আসতে লাগলাম। বটের রাজ্য ছেড়ে গ্রামে পা রাখতেই মেলার দিক থেকে হঠাৎ প্রবল হইচই কানে এসে পৌঁছাতে লাগল। আমি নরেনের দিকে ঘুরে তাকাতেই সে উৎফুল্ল গলায় বলল, 'ওই, ওরা এসে গেছে! চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন!'

দ্রুত পা চালিয়ে নরেন আমাকে নিয়ে দিঘির পাড়ে এল। ছোট্ট মেলার পরিসরটুকুর মধ্যে দুশো-আড়াইশো নতুন লোক এসে পড়ায় হঠাৎ ভিড়টা খুবই বেড়ে গেছে। ওপারের মায়েরা তাদের শিশুদের নিয়ে ডুব দিয়ে উঠছে। শিশুকে তার বাবা কিংবা দাদা, দিদির হাতে দিয়ে সে পাথরের বাটির দুধে চুল ভিজিয়ে মূর্তির ভাঙা খণ্ডগুলোর উপর দিয়ে বুলিয়ে নিচ্ছে। সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুর পাশাপাশি খঞ্জ, অন্ধ, পোলিয়োদষ্ট ইত্যাদি শিশুরাও আছে। শিশুরা মিঠাই খাচ্ছে, বাঁশি, তালপাতার সেপাই, পুতুল, বেলুন এসব কিনছে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে। সমস্ত মেলা জুড়ে আমি শুধু যেন

শিশুই দেখছি, শিশুদের মহামেলা। নরেনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি শুধু দেখছি। যেন শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া এইসব মানুষের আর কিছু চাওয়ার নেই।

একটা মাইকে মাঝে মাঝে গান বাজছিল, মাঝে-মাঝে কিছু ঘোষণা হচ্ছিল। এইবার শুনলাম মেলার কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিচ্ছে, 'ওপারের ভাই-বোনেরা, আপনাদের সময় প্রায় শেষ। আর পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনারা বারুণীর স্নান সেরে, মেলার কেনাকাটা সেরে ওপারে ফিরে যাবেন দয়া করে। আগামী বছর এই দিনে আপনাদের শিশুদের নিয়ে আবার আসবেন, নিমন্ত্রণ রইল। শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। মা ষষ্ঠীর কৃপায় আপনাদের সন্তান-সন্ততি সবাই কুশলে থাকুক। সবার শুভ হোক, মঙ্গল হোক' এসবের সঙ্গে, 'ব্যাঙ্কের ম্যানেজারবাবু, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের প্রচারকেন্দ্রে একবার আসবেন', এই ঘোষণাও ছিল।

সুতরাং নরেনের সঙ্গে মেলার প্রচারকেন্দ্রে আসতে হল। দিঘির দক্ষিণপাড়ে এক জায়গায় কয়েকটি চেয়ার পাতা ছিল। তার একপাশে এক টুকরো পলিথিনের তাঁবুর চালা। সেখানে ছোটোখাটো একটা পুজোর আয়োজন হয়েছিল। একজন পুরোহিত সেই পুজোর আয়োজন সব গুছিয়ে একটা থলেতে ভরে নিচ্ছিল।

আমাদের চেয়ারে বসতে বলে একজন কর্মকর্তা পুরোহিত ঠাকুরকে বলল, 'পণ্ডিত মশাই, আসুন একটু জল খেয়ে নিন।'

মেলার সেক্রেটারি এগিয়ে এসে আমার পাশে বসতে বসতে বলল, 'ম্যানেজারবাবু না থাকলে আজ আর বাংলাদেশিদের এপারে আনতে পারতাম না। খুব করেছেন আপনি, ওঃ!'

'আমি আবার কী করলাম!' আমি সত্যিই বুঝতে পারছিলাম না ওই সৈনিকের সঙ্গে চেষ্টা করে হিন্দি বলে আমি কী উপকার করেছি এদের।

সেক্রেটারি বলল, 'না না, আপনি না থাকলে আজ আর আনতেই পারতাম না ওদের। মাসদুয়েক আগে বি এস এফের গুলিতে ওপারের একটা লোক খুন হয়েছে। সেই নিয়ে বি ডি আরের সঙ্গে এদের ভয়ানক রেষারেষি চলছে। কাজেই ব্যাপারটা ওদের পক্ষেও খুব সহজ ছিল না। আপনি না থাকলে—'

আমি অগত্যা মেনেই নিলাম ব্যাপারটা। নরেন উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। বলল, 'আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই ব্রজরাখাল ভট্টাচার্য।' আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে পণ্ডিত বললেন, 'ছিলাম, এখন রিটায়ার্ড, নমস্কার।' উদ্যোক্তারা আমাদের হাতে হাতে মিষ্টির প্লেট দিয়ে গেল। আমি নরেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে ওপারের মেয়েরাও দিঘিতে ডুব দিল, ওরা কি সবাই হিন্দু?'

আমার কথার উত্তর দিলেন পণ্ডিতমশাই। বললেন, 'আজ্ঞে না, সবাই কী করে হিন্দু হবে? মুসলমানের মেয়েরাও দিঘিতে ডুব দেয় সন্তান কোলে করে। সন্তান আকাঙ্ক্ষা, সন্তানের মঙ্গলের থেকে বড়ো আকাঙ্ক্ষা মায়েদের আর কী আছে? সেই কারণেই, বুঝলেন কিনা—'

বুঝলাম হয়তো, আবার যেন বুঝলামও না। তবে মেনে নিলাম যে এই শিশুতীর্থে সবই সম্ভব। তবুও আরও কয়েকটি বিষয়ে পরিস্কার হবার জন্য পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ মেলাকে তো লোকে বারুণীর মেলা বলে, পণ্ডিতমশাই? দিঘিতে যে স্নান, সেও তো বারুণী স্নানই হবে। তার সঙ্গে মায়েরা শিশু কোলে নিয়ে ডুব দেবে — এর সম্পর্ক কী?'

পণ্ডিত একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আজ পঁয়তাল্লিশ বছর হল আমি এই বারুণীস্নানের পৌরোহিত্য করছি। এত বছরের মধ্যে একমাত্র আপনিই আমাকে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেন। ভালো, মরার আগে জেনে গেলাম যে অন্তত একজন মানুষেরও এসব বিষয় নিয়ে আগ্রহ আছে'। প্লেট থেকে মিষ্টি তুলে মুখে দিতে দিতে বললেন, 'খান, মিষ্টি খান, এরা রসগোল্লাটা ভালোই করে। খান, পরে আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে', বলে আমিও রসগোল্লায় কামড় বসালাম।

সত্যিই ভালো রসগোল্লা।

খাওয়া শেষ করে পণ্ডিত হাতমুখ ধুলেন, জল খেলেন। তারপর গামছায় মুখ মুছে ধীরেসুস্থে বললেন, 'চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্র ও শনিবার যুক্ত হলে, তাকে মহা-মহাবারুণী বলে। ওই মহাবারুণীতে একবার গঙ্গাস্নান করলে যে পরিমাণ পুণ্যপ্রাপ্তি হয়, তার পরিমাপ এক কোটি সূর্যগ্রহণকালে এক কোটি বার গঙ্গাস্নান তুল্য। আজ সেই মহাতিথি, মহা-মহাবারুণী যোগ, বুঝতে পেরেছেন?'

মনে হল কিছুটা যেন বুঝতে পেরেছি। বললাম, 'তার মানে ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন করে অমৃত, অপ্সরা, লক্ষ্মী, বারুণী ইত্যাদি যেসব বস্তু, দেবী উত্থিত হয়েছিল সেই বরুণকন্যা বারুণীর সঙ্গে এই বারুণী যোগের কোনো সম্পর্ক নেই?'

পণ্ডিত বললেন, 'সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারুণীর সঙ্গে বারুণী যোগের কোনো সম্পর্ক নেই। বারুণী যোগ হল তিথি নক্ষত্রের সংস্থানগত একটি যোগ। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্র যুক্ত হলে, তাকে বারুণী বলে।'

যদিও ঠিক এই বিষয়টি আমি জানতে চাইনি, তবুও পণ্ডিত ব্রজরাখালের ব্যাখ্যায় একটা নতুন কাণ্ডজ্ঞান বাড়ল। আমি যে বিষয়টা নিয়ে একটা ভুল ধারণা করে বসে আছি, সেটা তিনি ঠিকই বুঝেছেন।

বললাম, 'কিন্তু পণ্ডিত মশাই, বারুণী স্নান তো স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কাম্য। কিন্তু এখানে তো দেখছি শুধু মেয়েরাই তাদের শিশুদের কোলে নিয়ে ডুব দিচ্ছে এবং উঠে নানাপ্রকার আভিচারিক ক্রিয়ায় সম্ভবত তাদের মানত রক্ষা করছে!'

পণ্ডিত বললেন, 'তাকিয়ে দেখুন পুব-দক্ষিণ কোণে একখানা ছোটো ঘাট আছে। সকালের দিকেই সেই ঘাটে ইচ্ছুক পুরুষেরা স্নান সেরে নিয়েছে। তবে বারুণী স্নানের জনপ্রিয়তা সর্বত্রই আগের থেকে অনেক কম। তাই বারুণী দিঘিতে বারুণী স্নানের বদলে হয় সম্প্রীতির মেলা আর শিশুদের স্বাস্থ্য, পরমাই ইত্যাদির জন্য ডুব।'

ব্রজরাখাল পণ্ডিতকে তার কথাবার্তার ভঙ্গিতে তাকে আমার খুব আধুনিক মনে হল। বললাম, 'কিন্তু পণ্ডিত মশাই, বারুণী দিঘি থেকে ষষ্ঠীপুকুরে রূপান্তরের মধ্যে একটা কিছু স্থানমাহাত্ম্য আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

পণ্ডিত শ-দুয়েক গজ দূরের সীমান্তের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। একটু উদাস হল তার দৃষ্টি। পরে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'মাহাত্ম্য তো আছেই ম্যানেজার সাহেব, তা সে স্থানের হোক কিংবা দেব-দেবীরই হোক। ওই দিকে ওপারে, এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে একটা গ্রাম আছে, তার নাম বিরল। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে আমার মা, ছ-সাত মাসের গর্ভবতী তখন তিনি, সেই পাঁচ-ছ মাইল আমার বাবার সঙ্গে হেঁটে এসেছিলেন এই চৈত্রমাসের খরতাপ উপেক্ষা করে এই বারুণী দিঘিতে ডুব দেবেন বলে। কোনো এক ভিখারি বোষ্টুমি তাঁকে নাকি বলেছিল, এই দিঘিতে ডুব দিলে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমার মা মৃতবৎসা ছিলেন। পরপর তিনবার অপুষ্ট, মৃত ভ্রূণ জন্ম দিয়ে তাঁর বড়ো দুর্নাম হয়েছিল। ডুব দেওয়ার আগে মা বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, মায়ের গর্ভে বসে সে কথা আমি শুনেছি। দু-মাস পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই, আমার মায়ের খুঁতের নাম দূর হয়। মাহাত্ম্য তো কোথাও-না-কোথাও আছেই ম্যানেজার সাহেব, না হলে, এত দুঃখী মানুষ যাবে কোথায় বলুন?'

বেশ কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ এসে ঝপাঝপ পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ে প্রণাম করল। কেউ কেউ কুশল জিজ্ঞেস করল। অন্যমনস্ক ব্যক্তির মতো ব্রজরাখাল তাদের প্রণাম গ্রহণ করলেন। দু-একজন বয়স্ক মানুষকে হঠাৎ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন তাদের মা-বাপের কুশল। জনা দুয়েক অল্পবয়স্ক পুরুষ মানুষ আমার পায়ে হাত দিতেই আমি অসম্ভব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'আপনার দৌলতেই আজ আমরা এখানে আসতে পেরেছি', বলল একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমার দৌলতে! কীরকম?'

প্রৌঢ়া বলল, 'নয়তো ছাড়ত ওই যমদূত আজকে আমাদের? আপনি বললেন বলেই ছাড়ল। ওই কলাগাছের আড়াল থেকে সব দেখেছি।'

পণ্ডিত ব্রজরাখাল বললেন, 'স্থানমাহাত্ম্যে নিমিত্তের ভাগী হওয়া বিড়ম্বনার হলেও সুখকর। ওরা সব আমার নিজের গ্রাম বিরলের মানুষ। বৎসরান্তে এই একদিন অনেকে এসে দেখা করে যায়।'

কিছু ব্যবহারিক লক্ষণ দেখে গ্রামীণ হিন্দু-মুসলমান চেনার দক্ষতা আমার হয়েছে। যারা এতক্ষণ পণ্ডিত ব্রজরাখালকে জেঠা, কাকা, দাদু সম্বোধনে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে, কুশল জিজ্ঞেস করছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই যে মুসলমান, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। এমনকি যে মহিলা এসে আমাকে প্রকারান্তরে ধন্যবাদ জানাল, সে যে মুসলমান তা তো তার ঘোমটার ঢঙেই বিদ্যমান।

আমি একফাঁকে অনুচ্চে পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ষষ্ঠীপুকুর বা বারুণী দিঘিতে এই সাড়ম্বর পুজোআচ্চার মধ্যে ডুব দিতে এদের বাধা দেয় না এদের সমাজপতিরা?'

পণ্ডিত বললেন, 'কিরে ইস্রাফিলের মা, সাহেব কী বলছেন?'

মহিলা আমার কথা ঠিকই শুনেছে, কাজেই আর-একবার বলতে হল না আমাকে।

সে বলল, 'ছার, ছাওয়ালের তংকে পুকুরে নেবে ডুব দেবে, তাতে কার কী? ছাওয়ালের পরমাই, ছাওয়ালের সাইস্থ্য, এগ্‌লা তো ছাওয়ালের মাওক্‌ই দেখবা হয়, লয়?'

বিষয়বস্তু তাকে আচমকা আবেগের আবর্তে ফেলে দিয়েছে, তাই এতক্ষণের সযত্ন মান্য ভাষা ভুলে আঞ্চলিক হয়ে উঠল ইস্রাফিলের মা।

আমি হেসে বললাম, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

ওপারের লোকজন একে-একে পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করে ওপারের দিকে চলে গেল। মেলার লোকজনও আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। নরেন আরও দু-ভাঁড় চা নিয়ে এসে আমার ও পণ্ডিতমশাইয়ের হাতে দিল।

চা খেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মহা-মহাবারুণী স্নানে কী পুণ্য হয় পণ্ডিতমশাই?'

পণ্ডিতমশাই আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ত্রিকোটি কুল উদ্ধার হয়!'

'তার অর্থ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'উপরিতন ও অধস্তন ত্রিকোটি পুরুষ উদ্ধার হয়,' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'একটা ডুব দিয়ে আসবেন নাকি ম্যানেজারবাবু?'

'আমি?' আমি খুব অবাক হয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের চোখে চোখ রাখতে তিনি তাঁর কাঁধের নতুন গামছাখানা হাতে করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের চোখ দেখতে পেলাম না আমি। বেলাশেষের ছায়ায় সেই চোখ জোড়া আবছা হয়ে গেছে। তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিঘির দিকে চোখ ফেরালাম। দিঘির জলে অন্ধকার নেমে এসেছে।

'ওই দিকে, ওই পুব-দক্ষিণ কোণে নেমে একটা ডুব দিয়ে আসুন', পণ্ডিত বললেন।

পুব-দক্ষিণ কোণ ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আরও দূরে, যেখানে চৈত্রের মাঠ আদিগন্ত শূন্যতা নিয়ে পড়ে আছে। সেই আলো কমে আসা আবছা মাঠের একেবারে শেষ প্রান্তে কুঁজো একটা বিরাট আকারের চাঁদ যেন মাঠের উপরেই উঠে বসে আছে, এমন মনে হল আমার। ভীষণ কুৎসিত সেই চাঁদ, ফ্যাকাশে রঙের আলো সেই চাঁদের। আমি সেই চাঁদের দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলাম।

পণ্ডিত বললেন, 'ওই হচ্ছে সেই চাঁদ, চৈত্রের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথির চাঁদ, আজ শনিবার শতভিষা নক্ষত্রে যুক্ত হয়েছে, আজ সেই মহাতিথি মহা-মহাবারুণী। আর কিছুক্ষণ পরে চতুর্দশী পড়ে যাবে। তখন ডুব দিলেও কোনো ফল পাওয়া যাবে না ম্যানেজার সাহেব। এই সুযোগ আপনার জীবনের একটাই সুযোগ।'

আমার ভিতরে আচমকা একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল। আমার মনে হল, পণ্ডিত আমাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিচ্ছেন। মনে হতেই আমার অহং লাফ দিয়ে উঠল। আমি বললাম, 'পৃথিবীতে মানুষের কি তিন কোটি বছরের প্রজন্মের কাল অতিক্রান্ত, পণ্ডিতমশাই?'

পণ্ডিত একটু থমকে গেলেন। কিন্তু সে শুধু সামান্য সময়ের দম নেওয়ার জন্য বোধ হয়। তারপরে বললেন, 'লক্ষ-কোটির হিসাব আপনি ব্যাঙ্কের লোক, আপনিই ভালো জানবেন ম্যানেজার সাহেব। তবে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শুধু ঊর্ধ্বতন মানুষকে ধরলে চলবে কেন?'

আমি সুযোগ পেয়ে পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিবর্তনের ধারাবাহিকতার তত্ত্ব আপনি মানেন, পণ্ডিতমশাই?'

পণ্ডিত বললেন, 'অন্তত কূর্ম, বরাহ থেকে মানতে তো কোনো আপত্তি নেই!'

ওরে বাবা, এই মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়াও তো কম বিপদের নয়! এদিকে নরেনও তো আসছে না যে ছুতোনাতা করে উঠে যাব।

নরেনের খোঁজে ঘাড় ঘোরাতেই আমার আবার নজর পড়ল মাঠের উপরের সেই কুঁজো চাঁদটার দিকে। চাঁদ এইটুকু সময়ের মধ্যে মাঠের উপরে অন্তত হাত পনেরো

উচ্চতায় উঠে এসেছে। তার আকৃতি আরও বড়ো হয়েছে। রং হয়েছে টকটকে লাল। একটু আগেই সে না ফ্যাকাশে ম্যাড়মাড়ে রঙের ছিল!

চন্দ্রাহত বোধ হয় একেই বলে। আমি সেই চাঁদের দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিন কোটি বছর আগেও কি চরাচরবিস্তৃত শূন্যতার উপর মহা-মহাবারুণীর চাঁদ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকত!

না, চাঁদ দাঁড়িয়ে নেই। পলক ফেললেই বোঝা যায় পলক ফেলার আগে চাঁদ যেখানে ছিল, পরে আর সেখানে নেই, একটু উপরে উঠে গেছে। শূন্য প্রান্তর এখন নির্দিষ্ট অবয়বহীন একটা প্রশস্ত ধূসর চাদরের মতো। দিঘির ওপারের একটা গাছ খানিকটা আড়াল সৃষ্টি করতে শুরু করলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে চাঁদকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে লাগলাম।

এখন তাকিয়ে থাকলেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে চাঁদ ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠছে। চাঁদের রংও ভয়ংকর রক্তলাল থেকে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হয়ে এখন প্রকৃতই সুহাসিনী চন্দ্রমা। এই সময় মাঠের দিক থেকে বাতাস বয়ে আসতে শুরু করল। চৈত্রের তপ্ত মাঠের উপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসও তপ্ত। সারাদিনের নানা নতুন অভিজ্ঞতার ব্যস্ততায় দগ্ধ দিনের — গরমের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

ঘাড়ের উপর একখানা হাতের স্পর্শ পেতে আমি চাঁদের দিক থেকে মুখ ফেরালাম। পণ্ডিত উঠে এসে আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। বললেন, 'হাজার বছর আগে এ জায়গাটা একটা দেবস্থান ছিল, তার অজস্র প্রমাণ এ জায়গার অনেকটা জুড়েই ছড়িয়ে আছে। তখন নিশ্চয়ই এই দিঘি আরও অনেক বড়ো ছিল, না? উত্তর পাড়ের কোথাও মাতৃকাশ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা দেবসেনার মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের ভগ্নাংশ এই দিঘির পাড়ে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। মায়েরা তাদের কেশ বাটির দুধে ভিজিয়ে সেইসব ভাঙা পাথরখণ্ডগুলোকে এখনও মার্জনা করে। সাহেব, নরেনের সঙ্গে গিয়ে তুমি যে ভগ্ন মূর্তি বটগাছের নীচে দেখে এসেছ, তিনিই এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেবসেনা ষষ্ঠী। আমার কৈশোরে ওই ভাঙা মূর্তিটি এই দিঘির পাড়েই পড়ে ছিল। কে বা কারা ওঁকে ওই দুর্গম বটের জটাজঙ্গলে নিয়ে গিয়ে রেখেছে, তা আমার জানা নাই।'

পণ্ডিত আমার সঙ্গে সম্বোধনে আরও সহজ হলেন। আমি বললাম, 'আমার নাম মনোতোষ পণ্ডিতমশাই।'

চাঁদকে আড়াল করে এবারে একটি ঘনপত্রপল্লবিত গাছ আমাদের সামনে। কথা বলতে বলতে আমরা ডানদিকে অনেকটাই এগিয়ে গেলাম। মেলার লোকজন প্রায় সবাই চলে গেছে, বাকি আছে কেবল দোকানিরা। অন্ধকার ঘনই এখন। একটা জেনারেটর আগাগোড়াই ভট্‌ভট্ করে চলছিল, এখন কোলাহল কমে যাওয়াতে কানে পীড়াদায়ক

হতে শুরু করেছে। হঠাৎ মেশিনটা থেমে গেল। সমস্ত মেলায় টিমটিম করে যে বাল্বগুলো জ্বলছিল, সেগুলোও সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলো যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। দিঘির জলে চাঁদের আলোর প্রতিফলন সমস্ত জায়গাটা জুড়ে একটা মায়াজগৎ তৈরি করল।

পণ্ডিত তখনও আমার কাঁধে হাত রেখে। বললেন, 'চলো, সাহেব, পুব-দক্ষিণের ওই ঘাটে যাই। আমিও তোমার সঙ্গে না হয় আরেকবার ডুব দেব। ছ-কোটি পুরুষের উদ্ধার পাওয়া না হয় নাই হল, সারাদিনের রোদে ভাজাভাজা হওয়া শরীরটা তো শীতল হবে?'

আমার মধ্যে যেন কী হল। আমি তাঁর হাতের আশ্রয় ছাড়িয়ে দৌড়ে, যেখানে বসে ছিলাম, সেখান থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে এলাম। বললাম, 'চলুন, কিন্তু ডুব দেওয়ার আগে আমাকে বলতে হবে, পঁচাত্তর বছর আগে মায়ের গর্ভে শুয়ে মায়ের কথা আপনি কী শুনেছিলেন!'

পণ্ডিত হাঁটতে হাঁটতে থেমে পড়ে বললেন, 'ও, সেই কথা? আচ্ছা বলব'খনে।'

আমাদের সামনে ফাঁকা মাঠ, বামে দিঘির ওপারে বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ আর দক্ষিণে কিছু দূরে সেই বটের জটিল সাম্রাজ্য। বাঁ দিকের প্রান্তরের উপরের সেই গিব্যাস চাঁদ, যার কোনো সম্যক বাংলা শব্দ নেই, অজস্র কিরণ ঢালছে আমাদের ধরাধামে। আর মাত্র তিনদিন পরে সে পূর্ণিমায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পূর্ণতা পাবে।

আমরা পুব-দক্ষিণ ঘাটের প্রায় পাড়ে এসে পৌঁছেছি। পণ্ডিত চাঁদের দিকে তার বাঁ-হাতখানা কাত করে বললেন, 'সাহেব, রাত ছটা আটান্ন মিনিটে মহা-মহাবারুণী যোগ ছেড়ে যাবে। এখন বাজে ছ-টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আর মাত্র তেরো মিনিট পার হলেই এই মাহেন্দ্রক্ষণ চলে যাবে। সারা জীবনে তুমি আর দ্বিতীয়বার এই সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ। এসো, বস্ত্রত্যাগ করে জলে নেমে পড়ি। এসো, আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি করো!'

এই ঘাটে চাঁদ তার পরিপূর্ণ শোভায়। কাছের ও দূরের প্রান্তর, দশ হাত দূরের দিঘি, গ্রামের গাছপালা, সমস্ত চরাচর জ্যোৎস্নায় ভাসছে।

'কেউ নেই এখানে মনোতোষ, শুধু তোমার তিন কোটি পিতৃপুরুষ, অধস্তনরা যেমন তোমার প্রকল্পে, ঊর্ধ্বতনেরাও তাই। তবে মানুষকে শুচি হতে হলে যেমন দৈনিক স্নান করতে হয়, তেমনি সুযোগ পেলেই পুণ্যস্নানও করতে হয়। তাতে মানুষ তার বৃত্তি এবং প্রবৃত্তিজাত পুরুষানুক্রমিক পাপ থেকে মুক্তি পায়। পুণ্যের ওই ব্যবস্থাটুকুও না থাকলে হতভাগ্য মানুষ কোথায় গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে? এসো মনোতোষ, এখানে আমাদের নগ্নতা দেখার কেউ নেই।'

পণ্ডিত ঘাটের কাছে গিয়ে যাবতীয় অঙ্গবস্ত্র খুলে নগ্ন হলেন। বললেন, 'এসো মনোতোষ,' পিছনে না তাকিয়ে তিনি জলে নেমে গেলেন।

আমি আর দ্বিধা করলাম না। অনুরূপ ভাবে নগ্ন হয়ে আমিও জলে নামলাম। সত্যিসত্যিই হিমশীতল জল। পায়ের নীচে জলের মধ্যে বাঁশের বাঁধা মাচান তির্যক হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। আমার সামনে পণ্ডিতমশাই। বুক পর্যন্ত জলে ডুবলে তিনি বললেন, 'থামো'।

আমি থামলে তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে এই পদটি তিনবার আবৃত্তি করে এই জলকে গঙ্গা জ্ঞান করে তিনবার ডুব দেবে। বলো, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা ত্রিপথগামিনী হে জাহ্নবি, আমার পাপ হরণ করো। অমৃত বারিধি হে দেবী ভাগীরথী কলুষ নাশ করে এ জীবন পুণ্য করো! হে গঙ্গা পতিতপাবনী, আমি তোমাকে প্রণাম করছি!'

পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আবৃত্ত পদগুলি আমিও আবৃত্তি করলাম এবং এইভাবে তিনবার ডুব দিলাম।

পণ্ডিত বললেন, 'চলো, এবার ওঠা যাক। কত যুগ যে এই দিঘির সংস্কার হয় না, কে জানে!'

আমরা দুজনে জলের নীচের মাচানের উপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে পাড়ে উঠে এলাম।

পণ্ডিতমশাই তার গামছার টুকরোটায় গা-মুছে ফের জলে নেমে ধুয়ে নিয়ে এলেন। নিংড়ে ঝাড়া দিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নেও, গা-মুছে নেও।'

উত্তরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠের উপর দিয়ে জোরালো হাওয়া এতক্ষণে নির্দিষ্ট সময় পরপর ঝাপটার মতো বয়ে আসছিল। আমরা নিশ্চুপে ফিরতে শুরু করলাম। প্রাচীন পৃথিবীর দুজন মানুষের মতো প্রাচীন কোনো পবিত্র অভিচার শেষ করে যেন ফিরছি আমরা। পণ্ডিত বললেন, ' "বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে," এরকম একটি গানের পদ আছে না রবিঠাকুরের?'

আমি বললাম, 'আমার ঠিক জানা নেই, তবে অনেকক্ষণ ধরে আমরা যেন সেই বেদনার আবহেই আছি।'

পণ্ডিত বললেন, 'তোমার নিশ্চয়ই আমার মায়ের প্রার্থনার বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন নেই?'

আমি বললাম, 'না, পণ্ডিতমশাই, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।'